প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

বৈশাখ
১৩৬৬

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস,
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

গোখলে

এক

আজ আমরা যে মহান পুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করতে যাচ্ছি, ভারতের ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

এই মহাপুরুষের নাম গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের রত্নগিরি জেলার কাতলুক গ্রামে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে গোপাল কৃষ্ণ জন্মলাভ করেন। জাতিতে ইনি ছিলেন মারাঠী।

গোপাল কৃষ্ণের পিতার নাম কৃষ্ণরাও গোখলে। কৃষ্ণরাও ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য সম্পদ না থাকলেও চরিত্র সম্পদে তিনি ছিলেন যে কোন ধনীর চাইতে অনেক উপরে। প্রতিবেশীদের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তাঁর মনটা কেঁদে উঠতো। কিসে তাদের দুঃখ দূর করা যায়, এই ছিল তাঁর চিন্তা। তাই নিজের সামান্য আয় এবং পরিমিত সঞ্চয় থেকেও তিনি অকাতরে দান করতেন।

তাঁর স্ত্রী সত্যভামা দেবীও ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। লেখাপড়া না জানলেও তাঁর মনটা ছিল অত্যন্ত উদার ও পরদুঃখকাতর।

পিতামাতার এই সদগুণরাশি গোপাল কৃষ্ণের চরিত্রে বিকশিত হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। অর্থ এবং সহায় সম্পদ না থাকলেও যে, মানুষ কেবল নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং চেষ্টার ফলে জীবনে যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পারে, মহাপুরুষ গোখলের জীবন তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দুই

পিতার স্নেহ-ভোগ গোখলের ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নি। অল্প বয়সেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর তাঁর লালন-পালনের ভার অর্পিত হয়। তাঁরও আয় যথেষ্ট ছিল না, অতি কষ্টে তিনি গোপালের পড়াশুনার খরচ চালাতে থাকেন।

দশবৎসর বয়সে গোপাল কৃষ্ণ কোলাপুর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। সেখানেই তাঁর প্রথম বিদ্যারম্ভ।

এই স্কুলে পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে একটি ছেলের বন্ধুত্ব হয়। ছেলেটির নাম রাণাডে। উত্তরকালে ইনিও একজন বিখ্যাত লোক বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই গোখলে কি রকম নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন

ছিলেন, তা' তাঁর সেই শৈশব জীবনের বিদ্যালয়ের একটি ঘটনা থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায়। একদিন তাঁর শিক্ষক মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের একটি অঙ্ক কষতে দিয়েছিলেন। অঙ্কটা কিছু কঠিন থাকায় অন্যান্য ছেলেরা কেউ তা' কষতে পারলো না। কিন্তু গোখলে নির্ভুলভাবে অঙ্কটা ক'ষে দিলেন। শিক্ষক মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে গোখলেকে ক্লাশের প্রথম স্থানে গিয়ে বসতে বললেন। কিন্তু বালক বিনত ভাবে উত্তর করলেন, "এ অঙ্কটা আমার নিজের বুদ্ধিতে আমি কষি নি, সুতরাং প্রথম স্থানে গিয়ে বসা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়।"

বালকের উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি! তুমি কার অঙ্ক দেখে করলে? ক্লাশের কোন ছেলেই তো অঙ্কটা কষতে পারে নি।"

গোখলে বললেন, "ঠিক এই অঙ্কটাই কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জন্যেই আমি এত সহজে কষতে পেরেছি, এতে আমার নিজের কৃতিত্ব নেই কিছুই।"

শিক্ষক মহাশয় বালকের সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা দেখে পরম পরিতুষ্ট হ'লেন।

এই স্কুল থেকেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল কৃষ্ণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিন

ম্যাট্রিক পাশ করে গোপাল কৃষ্ণ প্রথমে কোলাপুরের রাজারাম কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এই কলেজে তিনি বেশীদিন থাকেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলেজ পরিবর্ত্তন করে পুণার ডেকান কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এই কলেজেও তিনি বেশীদিন থাকলেন না। কিছু দিন পরেই তিনি বোম্বাই সহরে গিয়ে বিখ্যাত এলফিনস্টোন কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ থেকেই তিনি বি,এ. পাশ করেন।

গোখলের ইচ্ছা ছিল, তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসা অবলম্বন করেন। কারণ, সে ব্যবসায়ে উপার্জ্জন হয় যথেষ্ট। সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনায় তাঁর আর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হওয়া হ'ল না, বরং তাঁকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকরীর সন্ধান করতে হ'লো।

তখন গোখলের বয়স মাত্র ১৮ বছর। সেই অল্প বয়সেই তিনি পুণা সহরে 'নিউ-ইণ্ডিয়ান স্কুলে' শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

গোখলের জীবনের যত কিছু গৌরব, তা' এই শিক্ষকতা কার্য্য থেকেই। যদি তিনি দারিদ্র্য-ব্রত বরণ

না ক'রে ইঞ্জিনীয়ার হতেন তবে হয়ত অগাধ পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'তে পারতেন, কিন্তু যা'তে তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে সেই ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করতে পারতেন না।

দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের চাকরী গ্রহণ ক'রে কিছুদিন তিনি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। আজীবন স্কুল-মাষ্টারীই করতে হ'বে এ ধারণা নিয়ে গোখলে প্রথম চাকরীতে প্রবেশ করেন নি। ব'সে আছেন, অর্থেরও আবশ্যক, হাতের কাছে একটা মাষ্টারী পাওয়া গেল, অন্য কিছু সুবিধা না পাওয়া অবধি এটাই করা যা'ক, এমনি একটা ধারণা নিয়েই তিনি স্কুল-মাষ্টারী আরম্ভ করেন। শেষে কিন্তু এই মাষ্টারীই তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে দিল!

লোকমান্য স্বর্গীয় বাল-গঙ্গাধর তিলক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশের আরও কয়েকজন দেশসেবকের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। চার বছর পরে তাঁরা ঐ স্কুলে 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির সদস্যেরা প্রত্যেকে এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন যে, তাঁরা মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন নিয়ে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করবেন। তারপর মাসে ৩০৲ টাকা পেনশন পাবেন।

দেখতে দেখতে এই সমিতির সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হ'য়ে

বেশ বড় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'ল। এঁরা অর্থের লোভে বশীভূত না হ'য়ে পবিত্র শিক্ষাদান-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করলেন। এই সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। ইচ্ছা করলে তাঁরা উচ্চ পদে চাকরী করতে পারতেন। কিন্তু তা' না ক'রে শুধু দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁরা অতটা স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। এই স্বার্থত্যাগী কর্ম্মিগণের চেষ্টার ফলে কালক্রমে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলই বিখ্যাত ফার্গুসন্ কলেজে পরিণত হ'য়েছে। ও-অঞ্চলে ফার্গুসন্ কলেজ এক বিশিষ্ট শিক্ষায়তন। দেশীয় লোকদের দ্বারাই এই কলেজটি পরিচালিত হচ্ছে।

এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মিদলের মধ্যে গোখলেও ছিলেন একজন। কিন্তু যখন সর্ব্বপ্রথম তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হ'য়ে প্রবেশ করেন, তখন আজীবন যে এই ভাবে চিরদারিদ্র্য নিয়ে কাটাবেন, সে ধারণা তাঁর ছিল না। কিছুদিন পরে সেই মহৎ আদর্শে তাঁর হৃদয় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে; দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বিস্মৃত হ'য়ে তিনি এই দেশ-সেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন। সেইদিন থেকে গোখলের জীবনে সুমহান্ ত্যাগের ব্রত সুরু হ'লো।

চার

গোখলে কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। পরিশ্রমকে তিনি কখনো ভয় করতেন না। কাজকে যারা ভয় করে তারা কেনোদিন সংসারে সফলকাম হ'তে পারে না। ধন বা যশ অলসের ভোগ্য নয়। কাজ যাদের ভয় করে সংসারে তাঁরাই প্রকৃত বীর এবং কর্ম্মী। গোখলেও ছিলেন এমনি একজন কর্ম্মবীর।

কলেজে তাঁকে ইতিহাস এবং অঙ্কশাস্ত্র পড়াতে হ'তো, এইজন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হ'তো যথেষ্ট। কর্ম্মবীর গোখলে কিন্তু সে পরিশ্রমকে পরিশ্রম ব'লেই মনে কবতেন না। পরিশ্রম তাঁর কাছে ছিল একটা মহা আনন্দের ব্যাপার।

অধ্যয়ন-স্পৃহা ছিল গোখলের এত প্রবল যে, তিনি যখনি যেটুকু সময় পেতেন, তা' অনর্থক না কাটিয়ে পড়া-শুনা ক'রেই কাটাতেন। লোকে মাতৃগর্ভ থেকেই পণ্ডিত হ'য়ে জন্মায় না, তাকে সংসারে পড়াশুনা করে পণ্ডিত হ'তে হয়। গোখলের অগাধ পাণ্ডিত্যের মূল তাঁর অধ্যয়ন-স্পৃহা। জ্ঞানার্জ্জনের সময় মনে করতে হয়, আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ শিশু, কিছুই আমার জ্ঞান নাই। এই রকম মনোবৃত্তি নিয়ে যাঁরা জ্ঞানার্জ্জনে রত হ'ন তাঁরা সত্যি সত্যি

অগাধ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন ; আর যারা মনে করে, আমি একজন পণ্ডিত, জ্ঞান আমার অগাধ, তাদের পক্ষে এই পাণ্ডিত্যাভিমানই জ্ঞানলাভের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। গোখলে ছিলেন প্রথমোক্ত দলের। তিনি প্রবল জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা নিয়ে পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে অধ্যয়ন করতেন। কত বিনিদ্র রজনী কঠোর পরিশ্রম ক'রে যে তিনি পণ্ডিত হ'য়েছিলেন তার সংখ্যা নেই।

শুধু মনে বড় হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেই বড় হওয়া যায় না। সংসারে কার বড় হ'তে সাধ না যায়? সকলেই চায় বড় হ'তে। কিন্তু সেই ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের অবিরাম চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকে, তাঁরাই শেষে জয়ী হ'ন। বড় হওয়ার দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হয়। গোখলের মধ্যে এই চেষ্টা এবং অধ্যবসায় অতিমাত্রায় প্রবল ছিল ব'লেই তিনি অতবড় হ'তে পেরেছিলেন।

যদি তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ-চেষ্টা এবং অধ্যবসায় না থাকতো, তবে আজ তিনি সমগ্র ভারত-বাসীর শ্রদ্ধার অঞ্জলি লাভ করতে পারতেন না। নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান তিনি, পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কষ্ট ক'রে তাঁর বি, এ, অবধি পড়ার খরচ বহন করেন, তারপর অর্থকষ্টের জন্য বাধ্য হ'য়ে তাঁকে স্কুল-মাষ্টারী গ্রহণ করতে

হয়। আমাদের দেশে ত কতশত স্কুল-মাষ্টার আছেন, কিন্তু ক'জনের নাম এমন চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে? গোখলেকেও হয়ত এমনি স্কুল-মাষ্টারী ক'রেই অখ্যাত এবং অজ্ঞাত অবস্থায় চ'লে যেতে হ'তো। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল বড় হওয়ার ইচ্ছা এবং তার জন্য প্রবল চেষ্টা ও অধ্যবসায়। তাই স্কুল-মাষ্টারী ক'রেও তিনি অত বড় হ'তে পেরেছিলেন।

অধ্যবসায় এবং চেষ্টার বলে তিনি ধন-বিজ্ঞানে অপরিসীম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তাঁর সেই পাণ্ডিত্যের জন্য অবশেষে সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো। সকলে বুঝতে পারলো, ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর আড়ালে একটি মানুষের মতো মানুষ গ'ড়ে উঠ্‌ছেন।

মানুষের উন্নতির আর একটি কারণ হচ্ছে একটি বিষয় নিয়ে প'ড়ে থাকা। সংসারে জ্ঞানলাভের বিষয়ের অন্ত নাই। মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে সমস্ত বিষয়েই জ্ঞানলাভ ক'রে পণ্ডিত হওয়া সম্ভবপর নয়। যারা সমস্ত বিষয়েই পণ্ডিত হ'তে যায়, তাদের কোনোটাতেই কিছু হয় না। গোখলের স্বভাব কিন্তু এ ধাঁচের ছিল না, তিনি একটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভের জন্যই পরিশ্রম ক'রে গেছেন।

একটা বিষয়ে জানা, আর সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করা,—স্বতন্ত্র কথা। গোখলে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত

সবই জানতেন, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের তিনি প্রধান ভাবে আলোচনা করতেন না, তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ধন-বিজ্ঞান। সারাটা জীবন তিনি এই ধন-বিজ্ঞানের অনুশীলনেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

এই শাস্ত্রটা এত মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করার একটা হেতুও ছিল। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এদেশ বড় গরীব, অধিকাংশ লোকই দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, ভাল ক'রে পরতে পায় না; দেশের এই দারিদ্র্য গোখলের প্রাণে বড় ব্যথা দিত। কি করলে দেশের এই দারিদ্র্য দূর করা যায়, দেশের লোক পেট ভ'রে দুটি খেতে পায়, দেশের অর্থ দেশেই থাকে,—এই সব বিষয় চিন্তা করতেন ব'লেই ধন-বিজ্ঞান অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র ছিল তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ধন-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ ক'রে সেই বিদ্যাকে তিনি দেশের কাজে লাগিয়েছিলেন। যে বিদ্যা দেশের উপকারে, দশের উপকারে লাগে, সে বিদ্যা সার্থক। সেই বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা; সে শিক্ষায় সত্য সত্য গৌরব আছে। বিদ্যাশিক্ষা ক'রে চাকরী করতে আরম্ভ করলাম, যথেষ্ট টাকা আসতে লাগলো, সেই টাকায় নিজে এবং পরিবারবর্গ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিলুম,—তা' হ'লেই শিক্ষার চরম সার্থকতা হ'লো

না। নিজের আহারের সংস্থান ত পশুপক্ষীতেও ক'রে থাকে, তবে মানুষ আর ইতর জীবে পার্থক্য রইল কোথায়? দেশের ও সমাজের যারা উপকার করতে পারেন, হোন না তাঁরা গরীব, তারাই প্রকৃত মানুষ। গোখলেও গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে পবিত্র শিক্ষাদান-কার্য্য বরণ ক'রে নিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং সেই দারিদ্র্যের মধ্যে দেশের ও দশের উপকার ক'রে রাজাধিরাজের সম্মান লাভ করেছেন।

গোখলে ছিলেন বড় মিতভাষী। কাজের কথা ছাড়া বাজে কথা তিনি বলতে জানতেন না। অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা মুখে খুব ওস্তাদ, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু না; এমন কি, তাদের কথার কোন মূল্যও নেই। গোখলে তেমন বাক্‌সর্ব্বস্ব ছিলেন না। তিনি মুখে যা বলতেন, কাজেও তাই করতেন।

চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন গোখলে। কিন্তু বক্তৃতার সময় তিনি বাজে কথার চটকে লোককে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করতেন না, শ্রোতাদের বিষয়টি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে যতটুকু বলা দরকার, তিনি ততটুকুই মাত্র বলতেন। তিনি বুঝতেন, বাক্যের ছটায় লোককে ভুলাতে চেষ্টা না ক'রে যদি যুক্তি-তর্ক বা প্রমাণ দিয়ে ব্যাপারটি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে কাজ হয় ঢের

বেশী। গোখলে ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মী, তাই তিনি বাক্যের চেয়ে কাজটাই বুঝতেন ভাল।

আবার তাঁকে অনেক সময় মুখে কোনো কথা না ব'লে কেবল কাজ ক'রে যেতে দেখা গেছে। এমনি ছিলেন তিনি নীরব কর্ম্মী।

পাঁচ

গোখলের রাজনীতিক জীবনের সহকর্ম্মী ও গুরু ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। এঁর নাম আগেও একবার উল্লেখ করেছি।

রাণাডে তখন বম্বে-হাইকোর্টের জজ। কিন্তু জজ ছিলেন ব'লে যে তাঁর নাম এত বিখ্যাত হয়েছে তা' নয়। হাইকোর্টের জজ ত' কত লোকই হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের ক'জনের নাম লোকে স্মরণ ক'রে থাকে? যাঁরা বিখ্যাত হ'য়ে থাকবার মত কোনো গৌরবময় কাজ ক'রে গেছেন, তাঁদের নামই লোকে স্মরণ ক'রে রেখেছে। তখনকার বম্বে-প্রদেশের মধ্যে গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন একজন মহাপুরুষ। তাঁর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত বম্বে-প্রদেশে দ্বিতীয় আর একজনও জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর রচিত "মারাঠা শক্তির উত্থান"

("Rise of the Maratha Power") বইখানি মারাঠাদের একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। রাণাডের যদি আর কোন গুণ নাও থাকত, একমাত্র এই বইখানির রচয়িতা হিসাবেই তিনি ঐতিহাসিক সমাজে খ্যাতিলাভ ক'রে অমর হ'য়ে থাকতেন। তা' ছাড়া বম্বে-প্রদেশের সামাজিক বা রাজনীতিক যা' কিছু উন্নতি ইংরাজ রাজত্বে হ'য়েছে, তার সবই হ'য়েছিল রাণাডের চেষ্টায়।

রাণাডের এত গুণ ছিল যে, তাকে ভাবতে গেলে সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। সমুদ্র যেমন অসীম অনন্ত এবং অতলস্পর্শী, তেমনি গোবিন্দ রাণাডেরও গুণ অসীম অনন্ত, —তা ধারণার অতীত। লোক-চরিত্র বুঝতে পারার ক্ষমতা ছিল রাণাডের অদ্ভুত। কে কোন কাজের উপযুক্ত, কাকে দিয়ে কোন কাজ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদিত হবে, তা' রাণাডে লোক দেখেই বুঝতে পারতেন। জহুরী যেমন রত্ন দেখলেই চিনতে পারে, রাণাডে ছিলেন তেমনি মানব-রত্ন বেছে নেওয়ার একজন ওস্তাদ জহুরী।

ফুল যেমন তার সৌরভের গুণে ভ্রমরকে আকৃষ্ট ক'রে নেয়, গোখলেও তাই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করবার পর গোখলেকে তিনি আরও ভাল করে চিনবার সুযোগ পান। তিনি বুঝতে পারলেন, ঝিনুকের গর্ভে যেমন লোকচক্ষুর

অন্তরালে মুক্তা গড়ে উঠে, তেমনি এই মুক্তাটি গ'ড়ে উঠছে। এঁকে দিয়ে ভবিষ্যতে দেশের মহা উপকার সাধিত হবে। রাণাডে তার পর থেকেই ধীরে ধীরে গোখলেকে তাঁর দিকে টানতে আরম্ভ করলেন। গোখলেও রাণাডের অসীম গুণে মুগ্ধ ছিলেন, এ আহ্বানে আর তিনি নীরব থাকতে পারলেন না।

গুরু এবং শিষ্য উভয়েই উপযুক্ত হ'লে যে সুফল পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হ'লে আর অতটা হয় না।

রাণাডের হাতেই গোখলের রাজনৈতিক দীক্ষা। এর পূর্ব্বে আর তিনি কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি। রাণাডের কাছে দীক্ষা নিয়েই গোখলের নব-জীবনের সূত্রপাত হ'লো।

পুণা সহরে তখন "সার্ব্বজনীন সভা" নামে একটি বড় রাজনৈতিক সমিতি ছিল। সেই সমিতির দ্বারাই বম্বে-প্রদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হ'তো। এই সমিতির প্রধান পরিচালক ছিলেন রাণাডে, তাঁকে এর প্রাণ বলা যেতে পারে। গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত এই সমিতিকে মেনে চলতেন। এই সমিতির একখানা মুখপত্র ছিল, সেখানা তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হ'তো। রাণাডে গোখলেকে এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ক'রে দিলেন।

গোখলে এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণকেই তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ব'লে মনে ক'রে থাকেন। তিনি বলেন, সারা জীবন ধ'রে তিনি যে কাজ করে গেছেন, পত্রিকার সম্পাদন-ভার তাঁর উপর অর্পণ ক'রেই রাণাডে তাঁকে সেই কাজে দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাণাডে গোখলেকে রাজনীতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন সত্যিই কিন্তু তিনিও ত গোখলের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা করেছিলেন। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষায় তিনি গোখলের নিকট থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন। রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেকে নৈতিক শিক্ষাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে থাকেন, কিন্তু গোখলের চরিত্র সে ভাবে গঠিত হয় নি। কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, সকল বিষয়েই তিনি নীতি-শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, যে পর্য্যন্ত আমাদের চরিত্রগঠন না হবে, যে পর্য্যন্ত আমরা চরিত্র-বলে বলশালী না হ'ব, সে পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু থাকবে,—সে পর্য্যন্ত আমরা বড় জাতি হওয়ার শক্তি লাভ করতে পারবো না।

রাণাডেকে গোখলে গুরুর মতো ভক্তি করতেন। যদিও তিনি তাঁর সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে সহপাঠী বন্ধুভাবে না দেখে দীক্ষাদাতা গুরু বলেই মনে করতেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) সভাপতিত্ব জীবনের একটা অতি বড় গৌরবজনক সম্মান। ভবিষ্যৎ জীবনে গোখলে সে সম্মান লাভ ক'রেছিলেন। গোখলে নিজেই বলতেন যে, এই সম্মানের একমাত্র কারণ রাণাডে। রাজনীতিবিদ্ ব'লে গোখলের আজ যে সম্মান, রাণাডেই তাঁকে সেই রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ছয়

'সার্ব্বজনীন সভা'র সভ্যদের মধ্যে কার্য্যপন্থা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় সভ্যেরা দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়েন। নূতন দলের নাম হয় 'দাক্ষিণাত্য সভা'। গোখলে এই নূতন দলে যোগ দেন। তিনিই হন ঐ সভার সেক্রেটারী।

গোখলে বম্বে-প্রাদেশিক সম্মেলনের (Bombay Provincial Conference) পর পর চার বৎসর ধ'রে সেক্রেটারী ছিলেন। বৎসরের মধ্যে একবার ক'রে এই সভার সভ্যেরা সেই প্রদেশের এক এক স্থানে সমবেত হ'য়ে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে থাকেন।

ক্রমেই গোখলের রাজনীতিক জীবন বিকাশ লাভ করতে থাকে। ১৮৯৫ সালে পুণা সহরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার যে অধিবেশন হয়, গোখলে তার সম্পাদক ছিলেন।

পুণা থেকে 'সুধাকর' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুতো। সেখানার কতকটা ইংরেজী ভাষায় কতকটা

মারাঠী ভাষায় লেখা হ'তো। গোখলে চার বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৯৭ সালে গোখলে 'ওয়েলবি কমিশনে' সাক্ষ্য দিতে বিলাতে যান। ভারতের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য পার্লামেণ্ট মহাসভা এক কমিশন নিযুক্ত করেন। ওয়েলবি সাহেব ছিলেন সেই কমিশনের সভাপতি, তার নাম অনুসারেই ঐ কমিশনের নাম হয় 'ওয়েলবি কমিশন'। দেশের অনেক বড় বড় লোককে এই কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হ'য়েছিল। গোখলে তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

এ দেশের প্রজাদের কাছ থেকে গভর্ণমেণ্ট কত টাকা খাজনা পান এবং প্রজাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট কি বাবদে কত খরচ করেন, তা' গোখলে নির্ভীক চিত্তে স্পষ্ট ভাবে যে রকম ব'লেছিলেন আর কেউ তেমন পারেন নি। এতেই বুঝতে পারা গিয়েছিল, ধন-বিজ্ঞানে এবং এ দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গোখলে কত গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং কত খবর তিনি রাখতেন। এই সময় গোখলের বয়স ছিল মাত্র ৩১ বৎসর।

গোখলে খুব তার্কিক ছিলেন। তর্কের সময় সারগর্ভ যুক্তি-তর্কে তার সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারতো না। এমন কি, তখনকার ভারতের বড়লাট তার্কিক-চূড়ামণি

লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত গোখলের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে পেরে উঠতেন না। বাক্‌চাতুর্য্য গোখলের যত থাকুক আর না থাকুক, তাঁর যুক্তির ক্ষমতা ছিল অতি আশ্চর্য্য রকমের। এত তথ্য তাঁর সংগৃহীত থাকতো যে, তর্কের সময় তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ সংবাদ না নিয়ে কিংবা তথ্য সংগ্রহ না ক'রে তিনি তর্কে প্রবৃত্ত হ'তেন না। কাজেই গোখলেকে তর্কে পরাস্ত করা সহজ ছিল না।

গোখলে যখন বিলাতে, তখন বম্বে সহরে প্লেগ আরম্ভ হয়। ইতোপূর্ব্বে ভারতে আর এই রোগ হয় নি। কাজেই এই নূতন ভীষণ রোগের আবির্ভাবে দেশের লোক যার-পর-নাই ভীত হ'য়ে উঠলো। যাতে রোগ চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'তো। এই হাসপাতালে পাঠানো ব্যাপার নিয়ে চারদিকে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হ'লো। রোগী মৃত্যু-সময়ে মাতাপিতা স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের কাছেই মরতে চায়, আত্মীয়-স্বজনও চায় না যে রোগী তাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে মরুক। কাজেই প্লেগ হ'লেই লোকে সাধ্যমত গোপন ক'রে চলতে লাগলো, যাতে হাসপাতালে পাঠানো না হয়। এতে ফল অত্যন্ত ভীষণ হ'য়ে দাঁড়ালো, রোগ

গোপন করতে গিয়ে এই সংক্রামক দুরারোগ্য ব্যাধি দ্রুত বেড়ে চললো।

গভর্ণমেণ্ট এইবার আরো কঠোরতা অবলম্বন করলেন। প্লেগ যাতে অধিক বিস্তৃতি লাভ করতে না পারে, সেজন্য রোগী অনুসন্ধান ক'রে বার করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট গোরা সৈন্য নিযুক্ত করলেন। তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে রোগীর অনুসন্ধান করতে লাগলো এবং রোগী দেখতে পেলেই জোর ক'রে হাসপাতালে পাঠাতে লাগলো। গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় লোকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠলো। জোর ক'রে রোগী নিয়ে যাওয়াই সে অসন্তুষ্টির কারণ নয়। রোগীর অনুসন্ধানের জন্য গোরা সৈন্যদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত ঢোকবার অধিকার ছিল। গোরা সৈন্যেরা অনেকেই প্রায় অশিক্ষিত এবং বর্ব্বর, অন্দরে প্রবেশ ক'রে রোগী অনুসন্ধানের অজুহাতে নানারকম অত্যাচার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ক্রমে শুনতে পাওয়া গেল, গোরা সৈন্যেরা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে নানারকম অত্যাচার করতে আরম্ভ ক'রেছে। এতে এক আতঙ্কের উপর আর এক আতঙ্কের সৃষ্টি হ'লো। এতদিন মহামারীর অত্যাচার চলছিল, এখন আবার মানুষের অত্যাচার আরম্ভ হ'লো। চারদিকে লোকে সৈন্যদের এই আচরণে ক্ষেপে উঠলো। গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হ'য়েও কোনো ফল হ'লো না।

গভর্ণমেণ্ট সৈন্যদের দ্বারা অনুসন্ধান বন্ধ করলেন না, সুতরাং প্রজাদের অসন্তুষ্টি বেড়েই চললো।

অবশেষে বম্বে থেকে একজন লোক এই অত্যাচারের কথা বিলাতে গোখলেকে লিখে পাঠান। এই চিঠি পেয়েই গোখলে এর প্রতিকার করতে সচেষ্ট হ'ন। স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ ইতোপূর্ব্বে বম্বে গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। তখন তিনি সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বিলাতে গিয়ে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য হ'য়েছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষের একজন অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যে অমন ভারতহিতৈষী খুব কম দেখা যায়। এইজন্য তিনি 'ভারতবন্ধু ওয়েডারবার্ণ' নামে অভিহিত হ'তেন। গোখলে তাঁকেই উপযুক্ত লোক মনে ক'রে তাঁর কাছে সমস্ত কথা জানালেন। ওয়েডারবার্ণ এই অত্যাচারের কথা শুনে এতদূর মর্ম্মাহত হ'লেন যে, তিনি এই বিষয় নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

শুধু পার্লামেণ্টে প্রশ্ন নয়, গোখলেও খবরের কাগজে এসব কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন। বিলাতে এই নিয়ে একটা মহা গোলযোগের সৃষ্টি হ'লো। অনেকেই বম্বে-গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিতে লাগলেন।

পার্লামেণ্ট থেকে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠানো হ'লো। কিন্তু বম্বে-গভর্ণমেণ্ট

একেবারে সোজাসুজি জবাব দিলেন, "এ সব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা. এর মূলে এতটুকু সত্য নাই। যারা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এত বড একটা অন্যায় দোষারোপ করেছে তারা এর প্রমাণ দিক্।"

পার্লামেণ্ট থেকে ওয়েডারবার্ণের কাছে প্রমাণ চাওয়া হ'লো। ওয়েডারবার্ণ গোখলেকে প্রমাণ দিতে বললেন। গোখলের কাছে সেই চিঠিখানা ছাড়া আর অন্য কোনো প্রমাণ ছিল না, তাই তিনি পড়লেন মহা বিপদে। প্রমাণ দিতে হ'লে সেই চিঠিখানা দাখিল করতে অথবা লেখকের নাম প্রকাশ করতে হয়, তা'তে পত্রলেখক বন্ধুটির বিপদ ঘটতে পারে। ওদিকে ওয়েডারবার্ণেরও বিপদ কম নয়। তিনি যদি প্রমাণ দিতে না পারেন, তবে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য পার্লামেণ্টের প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

গোখলের জন্যই ওয়েডারবার্ণের এই বিপদ। গোখলে এজন্য খুব মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়লেন। দু'দিকে দুই বন্ধুর বিপদ, তিনি কি করবেন চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ওয়েডারবার্ণ পার্লামেণ্টের সভায় সকলের সম্মুখে ক্ষমা চাইলেন এবং প্রমাণ না নিয়ে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দোষারোপ ক'রেছিলেন ব'লে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, পত্রলেখক বাণাডে ছাড়া আর কেউ নন। অপর কোনো সাধারণ লোক হ'লে গোখলে কখনো ওয়েডারবার্ণের মত লোককে অমন ভাবে অপদস্থ হ'তে দিতেন না। রাণাডে তখন হাইকোর্টের জজ, তাঁর নাম প্রকাশিত হ'লে তাঁকে গভর্ণমেণ্টের কাছে অপদস্থ হ'তে হতো।

যা'হোক এই ব্যাপারে গোখলের খুব শিক্ষা হ'ল। সেই থেকে তিনি প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলতেন না। এক্ষেত্রে সে নিয়মেব অন্যথা হ'য়েছিল তার প্রধান কারণ, পত্রলেখকের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এবং দেশবাসীর প্রতি উৎপীড়ন। দেশবাসীর প্রতি অত্যাচারের সংবাদ দেশপ্রাণ গোখলের হৃদয়কে এমন ভাবে বিদ্ধ ক'রেছিল যে, অচিরে সে অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তিনি উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, যথাযথ প্রমাণ সংগ্রহেব কথা তাঁর আদৌ মনে হয় নি। পরে তিনি তাঁর এই দারুণ ভ্রম বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর থেকে গোখলে এমন সাবধান হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আর কখনো তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসব হ'তেন না।

এই ব্যাপার কিন্তু ওয়েডারবার্ণের ক্ষমাপ্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নি। এই জন্য গোখলেকেও ভুগতে হ'য়েছিল। তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন

বম্বে বন্দরে তাঁর জাহাজ ভিড়বামাত্র সেখানকার পুলিশ-কমিশনার সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে বলেন, বিলাতে তিনি বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ রটিয়ে গভর্ণমেণ্টকে লোকের চোখে যেভাবে হীন প্রতিপন্ন ক'রেছেন সেজন্যে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

গোখলে বললেন, "আমি বিলাতে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যা' বলেছি তা' সত্য ব'লে জেনেই ব'লেছি; কিন্তু তার যখন প্রমাণ দিতে পারছি না, তখন নিশ্চয়ই আমি সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবো।"

গোখলে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁর কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা চাইলেন। তাঁর এই ক্ষমা চাওয়া ব্যাপার নিয়ে দেশে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হ'লো। অনেকে গোখলের এই আচরণকে অত্যন্ত অন্যায় মনে ক'রে তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন। সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত তাঁর নিন্দা রটনা হ'তে লাগলো। লোকের চোখে তিনি যেন একটু হীন হ'য়ে পড়লেন। লোকের এই নিন্দাবর্ষণে গোখলে বিচলিত হ'লেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ অটল রইলেন। ক্ষমা চেয়ে দেশের লোকের মতের বিরুদ্ধ কাজ ক'রেছিলেন ব'লে তিনি অবশ্য খুবই দুঃখিত হ'য়েছিলেন; তা ব'লে তিনি কখনো এমন কথা বলেন নি যে, ক্ষমা চাওয়াটা তাঁর পক্ষে অন্যায় হ'য়েছে। তিনি

বরাবর ব'লে এসেছেন, প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রে তিনি বম্বে-গভর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি ক'রেছেন তার জন্য ক্ষমা চাওয়াটা কোনো ক্রমেই অন্যায় হয় নি, বরং ক্ষমা না চাওয়াটাই দোষের হ'তো। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে ব'লেছিলেন, "ক্ষমা চেয়ে যদি দেশের সম্মানে কোনো রকম আঘাত দিয়ে থাকি, তবে প্রতিজ্ঞা করছি যে, একদিন আমি এই অপমানের ক্ষত আরোগ্যের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

গোখলে অবশেষে দেশসেবার দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সাধন ক'রে গেছেন, তা'তে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'য়েছিল। যদিও ক্ষমা প্রার্থনার পর তাঁকে লোকের চোখে যথেষ্টই হীন হ'তে হ'য়েছিল, তবু শেষ জীবনে তিনি অতুলনীয় সম্মান লাভ ক'রেছিলেন।

সাত

১৮৯৮ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। গোখলে সেই কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁর বক্তৃতা পণ্ড ক'রে দিয়ে তাঁকে অপমানিত করবার জন্য শ্রোতারা নানারকম শব্দ ক'রে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেই অপমানে গোখলে এতদূর মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন যে, তারপর ক্রমাগত ছয় বৎসর কংগ্রেসে যোগদান করলেও কখনো বক্তৃতা দেন নি।

এই বৎসর গোখলের স্ত্রী পরলোকগমন করেন। স্ত্রী-বিয়োগে তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পান। তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। দেশের কাজে মন প্রাণ দিয়ে ডুবে থাকতে হ'লে সংসার থেকে দূরে স'রে থাকা দরকার,—গোখলে এটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে সংসারের সংস্রব একরকম ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে তিনি দেহ ও মন দেশের সেবায় সমর্পণ করলেন। গোখলের স্ত্রী দু'টি কন্যা রেখে মারা গিয়েছিলেন। কন্যা দু'টিকে তিনি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর হাতে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

১৯০০ সালে গোখলে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ন। পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সার ফিরোজ সা মেটা ১৯০২ সালে অবসর গ্রহণ করলে সেই পদে গোখলে মনোনীত হ'ন।

আমাদের দেশে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ব'লে দু'টি কথা আছে। রাণাডে যেমন ছিলেন গোখলের দীক্ষাগুরু, তেমনি মেটা ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। এই উভয় গুরুর শিক্ষাগুণেই গোখলে অত বড লোক হ'তে পেরেছিলেন।

ফিরোজ সা মেটা জাতিতে পার্শী। তিনি বম্বের একজন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান কেবল যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা' নয়; তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ এবং বক্তা ছিলেন। দেশের তৎকালীন

শ্রেষ্ঠ এবং গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের তিনি সভ্য ছিলেন। অত্যন্ত তেজস্বিতার সঙ্গে তীব্র ভাষায় তিনি গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যের কঠোর প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্র ভীত হ'তেন না।

গোখলে তাঁর দাদাকে খুব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করতেন। দাদাই তাঁকে শৈশব থেকে লালনপালন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। গোখলে দাদাকে পিতার মত এবং বৌদিকে মায়ের মত ভক্তি করতেন। কোনোদিন সে শ্রদ্ধা-ভক্তির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁদের অমতে গোখলে কখনো কোন কাজ করতেন না। দাদা এবং বৌদিও গোখলেকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। আগেই ব'লেছি, গোখলে স্ত্রী-বিয়োগের পর একরকম সংসার ছেড়ে দিয়েই দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। গোখলের দেশের কাজে সেই আত্মহারা অবস্থার মধ্যে দাদার মৃত্যু হয়। কাজেই সংসারের সমস্ত ভার আবার গোখলের ঘাড়ে এসে পড়লো। গোখলে তাঁর সেই সামান্য উপার্জ্জন দ্বারাই সংসার প্রতিপালন করতে লাগলেন। ভ্রাতৃবধূর যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেদিকে গোখলের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হওয়ার পর

থেকেই গোখলের খ্যাতি চারদিকে বিস্তৃত হ'তে থাকে। অনেকে যেমন সদস্যপদ লাভ ক'রেই ধন্য হয়, তিনি তেমন ছিলেন না। তিনি বুঝতেন যে, দেশের লোকের প্রতিনিধি হ'য়ে তিনি সেখানে প্রবেশ ক'রেছেন, তাদের অভাব-অভিযোগ এবং দুঃখ-কষ্টের কথা সরকারকে জ্ঞাপন করা তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি তাঁর সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে কোনো দিনই ত্রুটি করেন নি। তিনি বড়লাটের দরবারে প্রজাদের কথা এমন ভাবে জানাতেন যে, সে রকম আর আগে কেউ করে নি। তাঁর তেজস্বিতাপূর্ণ নির্ভীক বক্তৃতায় সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হ'য়ে যেতো। এমন কোনো তার্কিক ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে তর্ক ক'রে তাঁকে পরাস্ত করতে পারে। তাঁর সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে সকলেই ভয় পেতো।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের তিনি ছিলেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। তিনি যেদিন সভায় উপস্থিত না থাকতেন সেদিন যেন সভা নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়তো। সভায় কোনো তর্ক উঠলেই শত শত উৎসুক দৃষ্টি গিয়ে পড়তো গোখলের উপর—তিনি কি বলেন? আর বাস্তবিক গোখলে যা বলতেন, তার একটি বিশেষ মূল্য থাকতো, তিনি নিরর্থক যা' তা' কতকগুলো কথা বলতেন না, প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে অকাট্য ভাবেই সারগর্ভ তর্ক করতেন। লোকে শুনে মুগ্ধ

হ'তো, বিপক্ষদলও মনে মনে তার যুক্তি-তর্কের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারতো না।

গোখলেকে যখন সি. আই. ই. উপাধি দেওয়া হয়, তখন সেই উপাধি বিতরণের সভায় বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভগবানের নিকট আমি প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষে এরূপ শক্তিশালী আরও বহুলোক জন্মগ্রহণ করুক।"

আট

১৯০২ সালে গোখলে ফার্গুসন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলেজের নিয়ম মত তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা পেনশন পেতে থাকেন। গোখলের মত একজন শিক্ষক হারিয়ে ফার্গুসন কলেজ সত্যি সত্যি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। একে ত তাঁর মত একজন শিক্ষাদানে সুদক্ষ শিক্ষক অত্যন্ত বিরল, তার উপর আবার কলেজের বেশীর ভাগ উন্নতিই হয়েছিল তাঁর চেষ্টায়। কলেজের ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য তিনি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, তাতে কোনো রকম অপমান বোধ করেন নি। এই ভাবে তাঁর দ্বারা কলেজের প্রায় দু'লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় হ'য়েছে।

১৯০৪ সালে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। তিনি সেই অধিবেশনের

সেক্রেটারী হ'য়ে সেখানে গমন করেছিলেন। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁর অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন ক'রেছিল।

১৯০৫ সালে গোখলের জীবনের একটা কর্ম্মোৎসবের বৎসর। তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনে এমন বৎসর বোধহয় আর একটিও নাই। এই বৎসর রাণাডের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁকে অর্থ সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হ'য়েছিল। সেবারই কংগ্রেস থেকে তাঁকে বিলাতে পাঠানো হয়। ভারতবাসীদের দুঃখ-কষ্টের কথা সে-দেশবাসীদের কাছে ভাল ক'রে বিবৃত করাই তাঁকে পাঠাবার উদ্দেশ্য। গোখলে বিলাতে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটা সভায় বক্তৃতা ক'রেছিলেন। এতগুলো বক্তৃতা দেওয়ায় শীঘ্রই তাঁর গলায় অসুখ হয় এবং দেশে ফিরবার পথেই জাহাজে তাঁকে গলায় অস্ত্রোপচার করতে হয়। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হ'য়েছিল কাশীতে। বিলাত থেকে এসেই তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে হ'য়েছিল। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া জীবনের একটা সামান্য গৌরবের কথা নয়। কারণ, ভারতের কোটি কোটি অধিবাসী কংগ্রেসের সভাপতিকে তাদের নেতা ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়। এত বড় একটা গৌরব লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

এই বছরই গোখলে আর একটি কাজ করেন। সেটাই গোখলের জীবনের সবচেয়ে সেরা কীর্তি। এই

বৎসর তিনি "ভারত সেবক সমাজ" (Servant of India Society) নামে একটি দল তৈরী করেন। এই দলের উদ্দেশ্য,—দেশের সেবা করা, দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়কে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ ক'রে তোলা এবং দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করা। এই দলের সভ্যদের কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাঁরা নিজের বা পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থোপার্জ্জন করতে পারেন না, সমিতি থেকে তাঁদের পরিবার পোষণের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দেশের সেবায় তাঁদের জীবন সমর্পণ করতে হয়। জাতিভেদ বিস্মৃত হ'য়ে সকলকেই পরস্পরের সেবা করতে হয়। ভারতের সর্ব্বনাশের মূল কারণ জাতি-বিরোধ অপসারিত ক'রে সমস্ত ভারতবাসীদের নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের আকাঙ্ক্ষাতেই গোখলে এই সঙ্ঘ গঠন করেন। মাদ্রাজ, বম্বে, নাগপুর প্রভৃতি বড় বড় সহরে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে। গোখলে বাংলা দেশেও একটি শাখা স্থাপনের চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। এঁদের প্রধান কেন্দ্রস্থল হচ্ছে পুণা সহরে, এখানে তাঁদের একটা বড় মঠ আছে। গোখলে শেষ জীবনে বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে এই মঠে গিয়ে বাস করতেন। এইখানেই তিনি পরলোকগমন করেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যা নিয়েও গোখলে অনেক চিন্তা ক'রে গেছেন। হিন্দু যে মুসলমানকে এবং মুসলমান যে হিন্দুকে ভালবাসতে পারেন গোখলের জীবনে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আলিগড় কলেজের মুসলমান ছাত্রেরা তাঁকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তেমন অভ্যর্থনা বোধহয় তিনি কোথাও হিন্দুর কাছে পান নি। পথের উভয় পার্শ্বে ফুলের মালা ঝুলিয়ে বড় বড় তোরণ তৈরী ক'রে ছাত্রেরা তাঁকে গাড়ীশুদ্ধ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য যে দেখেছে, সে আর তা' ভুলতে পারে নি।

নয়

দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ উপনিবেশে প্রবাসী ভারত-বাসীদের উপর সেখানকার সরকার নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করেছিলেন। রাজপথ দিয়ে তাদের হেঁটে যাওয়া নিষেধ, উপযুক্ত ভাড়া দিয়েও ট্রেণের ভাল ভাল কামরায় যেতে পারবে না, সহরের মধ্যে তারা বাস করতে পারবে না, অন্যায় মত তাদের ট্যাক্স্ দিতে হবে—এই সমস্ত নানা অন্যায় অত্যাচার তখন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দিগের উপর অনুষ্ঠিত হ'তো। এই অন্যায় নিয়ম না মানলে ছিল কারাগার এবং অন্যান্য কঠোর উৎপীড়ন ভোগ।

মহাত্মা গান্ধী তখন সেখানে ব্যারিষ্টারী করতেন ; তিনি এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তিনি সেখানে উৎপীড়িত ভারতীয়দিগের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে তাদের পরামর্শ দিতে লাগলেন,—এ অন্যায় আইন আমরা কিছুতেই মানবো না, এতে যে-কোন অত্যাচার আমাদের সহ্য করতে হয় তা করবো।

তিনি নিজে আইন অমান্য ক'রে জেলে গেলেন, এবং আরও কত কি অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন। এমন কি, তাঁর স্ত্রী এবং ভগ্নী পর্য্যন্ত জেলে গেলেন! সেখানকার বহু ভারতবাসীও তাঁদের সঙ্গে জেলে যেতে লাগলো এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার আইন অমান্য ক'রে কারাদণ্ড ভোগ করতে আরম্ভ করলো। এমনি ক'রে সেখানকার ভারতবাসীদিগের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—কিছুতেই সেই অপমানজনক আইন মেনে চলবে না।

এই ব্যাপার নিয়ে বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা ও রক্তারক্তি হ'তে লাগলো। বিলাতে এবং ভারতবর্ষেও এই সংবাদ পৌঁছল। এই দুই দেশেও ভারতবাসীদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। ভারতবর্ষ থেকে চাঁদা তু'লে বহু টাকা আফ্রিকায় ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য পাঠানো হলো। বিলাতে যাঁরা ভারতবাসীদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁরাও

সেখানে এই ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ ক'রে দিলেন। এই সব অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন চলতে লাগলো।

গোখলে এই ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আলাপ-আলোচনা করলেন। তাঁর এবং মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সেখানে ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

ভারতবর্ষের চাকরীর অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য সরকার এক কমিটি নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের লোক কি রকম সরকারী চাকরী পায়, তাদের আরও বেশী এবং উচ্চ চাকরী পাওয়া উচিত কি না, তাদের বর্ত্তমান বেতন কত, এতে তাদের চলে কি না, আরও বেতন-বৃদ্ধি আবশ্যক কি না,—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করাই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। এই কমিশনের নাম 'পাবলিক সার্ভিস্ কমিশন'। ভারতীয়দের ভিতর থেকে একমাত্র গোখলেকেই এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করা হয়; এটা তাঁর পক্ষে বড় কম সম্মানের কথা নয়। আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুকাল পরে এই কমিশনে যোগদান করবার জন্য বিলাত যান।

গোখলের জীবনের একটা বড় কাজ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা। তিনি দেশের কাজে নেমেই বুঝতে

পারলেন যে, এদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষার যে রকম অভাব, তাতে এদেশের লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগান সহজ নয়। দেশের প্রকৃত অবস্থা যদি দেশবাসী বুঝতে না পারে, তবে দেশের উন্নতি হয় না; আর সেই অবস্থা বুঝতে হ'লে প্রথমে শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু ভারতবাসী শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি পশ্চাতে, শিক্ষার অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের অতি সামান্য। সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র হাজারে ১৫১ জন লোক কোনো রকমে লিখতে ও পড়তে জানে,—ভাল রকম লেখাপড়ার কথা দূরে থাক।

তিনি মনে প্রাণে অনুভব করলেন, দেশের প্রকৃত মঙ্গল করতে হ'লে সকলের আগে দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা আবশ্যক, তা না হ'লে দেশহিতের সমস্ত চেষ্টা একেবারেই পণ্ডশ্রম হবে।

কিন্তু ভারতবর্ষ একটি ছোটখাট দেশ নয়, এই বিরাট্ দেশের এতগুলো লোককে শিক্ষাদান করা সহজ কথা নয়। শিক্ষিত করতে হবে বললেই হয় না, সে শিক্ষার ব্যবস্থায় বহু অর্থের আবশ্যক। সরকারের সাহায্য ছাড়া সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তিনি তাই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ক'রে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানালেন। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন হবে যে, প্রত্যেক ছেলেকেই স্কুলে যেতে হবে। যে তার

ছেলেকে স্কুলে না পাঠাবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে,—এমন একটা আইন করা হোক। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যদেশেই শিক্ষার এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার রীতি আছে।

গোখলের এই প্রস্তাবে একটা আপত্তির কথা উঠলো। এই গরীব দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চলতে পারে না; কারণ যে গরীব, সে খেতেই পায় না; তার উপর আবার স্কুলের বেতন, পুস্তকাদি প্রভৃতির খরচ যোগাবে কোথা থেকে? তার চেয়ে সে যদি তার ছেলেকে শৈশব থেকেই কোনো পরিশ্রমের কাজে লাগায়, তাহ'লে সে কিছু কিছু উপার্জ্জন ক'রে সংসারের উপকার করতে পারে। শিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন হ'লে গরীবদের উপর একটা অন্যায় জুলুম করা হবে। সুতরাং এমন একটা আইন হওয়া উচিত যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোনো বেতন দিতে হবে না।

কথাটা গোখলেও বুঝতে পেরে শিক্ষা-আইনের পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন। তিনি ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে এই প্রস্তাবিত শিক্ষা-আইন সম্বন্ধে লোকের মতামত সংগ্রহ করেন। দেশবাসীর অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট এর সমর্থন না করায় গোখলের সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। কিন্তু কর্ম্মবীর গোখলে সে বিফলতায় বিন্দুমাত্র দমলেন না, তিনি অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে আইনটি পাশ করবার জন্য পরিশ্রম

আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভগবান তাকে বেশী দিন আর সংসারে থাকতে দিলেন না। তিনি বেঁচে থাকলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পাশ করিয়ে নিতেন।

বাস্তবিক, আমাদের দেশে যদি অন্যান্য সভ্যদেশের মত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক হয়, তবে শীঘ্রই দেশের অবস্থা যে পরিবর্ত্তিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দশ

গোখলে বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাল্য বিবাহের যে বহু দোষ, তাতে যে সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে—তাতে আর সন্দেহ নাই। বাল্যবিবাহের ফলেই হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত। গোখলে তার কন্যা দুইটির বাল্যকালে বিবাহ দেন নাই। তার মত ছিল যে, ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে তারপর উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করবে। ছেলেদের উপার্জ্জন করতে পাবার আগে বিবাহ করা কোনো মতেই সঙ্গত নয়। গোখলের জীবনকালের মধ্যে তাঁর মেয়ে দু'টির বিবাহ হয় নি।

গোখলে ছেলেদের যেমন শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি মেয়েদেরও উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

গোখলের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বড় মেয়েটি ইণ্টার-মিডিয়েট এবং ছোট মেয়েটি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়তেন। প্রত্যেক মেয়ের খরচের জন্য গোখলে মাসিক ৫০৲ টাকার ব্যবস্থা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি কন্যাদের এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা যেন অপর কারো সাহায্য গ্রহণ না করেন। কন্যারাও পিতার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। গোখলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এস, পি, সিংহ (তখনো তিনি লর্ড হন নি, বিলাতে ভারত-সচিবের সহকারীর কাজ করছিলেন) গোখলের কন্যাদের সাহায্যের জন্য ২৫০০০৲ টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ধন্যবাদ-সহকারে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

গোখলে ছিলেন নিরামিষভোজী। 'চাপাটী' জিনিষটি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁর খাওয়া-পরা চাল-চলনে কোনোরকম বিলাসিতা ছিল না। সাধারণ লোকের মতই তিনি চলতেন। কলকাতায় এলে তিনি ১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তাঁর বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে থাকতেন, এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ৫২।৩ নং পার্ক ষ্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের লাইব্রেরীতে বই পড়বার জন্য যেতেন। তিনি এতদূর হেঁটে আসেন কেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন,—"আমার মত গরীবের পক্ষে ট্রামে আসা কি সম্ভব?"

গণিতশাস্ত্রে গোখলের খুব পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর লেখা অঙ্কের বই বম্বে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

তিনি ছিলেন কর্ম্মী-সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের একটু বিশিষ্টতা ছিল। তিনি আত্মমুক্তির কামনায় সন্ন্যাস বরণ ক'রে নেন নি, সমগ্র জাতির মুক্তিকামনাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তার শিষ্যদেরও তিনি সেই মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়ে গেছেন।

এগারো

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাঙালী জাতিই ছিল গোখলের সবচেয়ে প্রিয়। বাঙালীকে তিনি বড়ই ভালবাসতেন এবং বাঙালীর প্রতি তাঁর একটি উচ্চ ধারণা ছিল।

তিনি বলতেন, ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র বাঙালী জাতিই নব নব চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক, এ বিষয়ে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের গুরু-স্থানীয়। বাঙালীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ফলেই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, "বাংলাদেশ আজ যা ভাবছে, সারা ভারতবর্ষ তা ভাববে কাল।"*

তাঁর এই একটিমাত্র কথায় তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির ললাটে যে গৌরব-টীকা অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিলেন, আর কেউ

* "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow."

তা করেন নি। বাঙালী জাতির সম্বন্ধে এত বড় গৌরবের কথা আর কখনো কোনো অ-বাঙ্গালীর মুখে শোনা যায় নি।

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন-কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিভাগের ফলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সারা বাংলাদেশে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, সেই বৎসর সারা ভারতের পুণ্যভূমি কাশীধামে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট বা সভাপতিরূপে গোখলে যে অনলবর্ষী বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তাঁর বাংলা ও বাঙালী-প্রীতি অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও, আজ তা সকলকেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ, কংগ্রেস-প্রেসিডেন্টরূপে গোখলের সেই বক্তৃতাটুকু বাদ দিয়ে গোখলেকে বুঝবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বৃথা, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের সেই একবিংশ অধিবেশন হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রায় ৭৬০ জন প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথের প্রস্তাব অনুসারে ও রমেশচন্দ্র দত্তের সমর্থনক্রমে মিঃ গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আসন গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি যে সামান্য দু'একটি কথা বলেছিলেন, তাতেই শ্রোতাদের কাছে তৎকালীন ইতিহাসের একটা আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তিনি বললেন, "সম্মুখে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা, আর তার আশে-পাশে উন্মত্ত তরঙ্গ, এই অবস্থায় আমাকে আজ কংগ্রেস-তরণীর হাল ধরবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করুন।"*

এই ভাবে সূচনা করে, আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তিনি বাংলার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, জ্বলন্ত ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বাংলা ও বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

লক্ষ লক্ষ বাঙালীর আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য ক'রে ক্ষমতা-গর্ব্বী রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে বিভাগ ক'রে বাঙালীর জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাংলাদেশ তাতে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে নানাভাবে তার প্রতিবাদ করেছিল। তথাপি তার প্রতিকারে ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে পরাধীন নিরস্ত্র জাতির একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ বিদেশী বর্জ্জন-ব্রত গ্রহণ করেছিল। তার ফলে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজশক্তি যে নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে মর্ম্মন্তুদ পীড়নে চূর্ণ-বিচূর্ণ

* Mr. Gokhale remarked that he was called to take charge of the vessel of the Congress with rocks ahead and angry waves beating around, and invoked the Divine guidance.—*How India fought for Freedom.* (Annie Basant)

করতে প্রয়াসী হয়েছিল, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে আজও তা কালিমা-মণ্ডিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

বাংলার সেই ব্যথা ও বেদনা মহাপ্রাণ গোখলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন। নিপীড়িত বাংলার অশ্রুধারা তাঁর নিজের চোখে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। বাংলায় সেদিন উৎপীড়নের যে হাহাকার ও আর্ত্তনাদ আকাশে-বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠেছিল,—সুদূর পশ্চিম প্রান্তে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণার এক গৃহ-কোণে গোখলের কাণে তারই মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তুলেছিল। তারই অনুভূতিতে আত্মহারা হয়ে, তিনি সেদিন তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ইংরেজ রাজশক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি বলেছিলেন—"এ রকম শাসনের দৃষ্টান্ত পেতে হ'লে, আমার বিশ্বাস, আমাদের সবাইকে ঔরংজেবের শাসন-কাল খুঁজতে হবে।...আমার মনে হয়, লর্ড কার্জ্জনের অনুরক্ত স্তাবক পর্য্যন্ত বলতে পারবেন না যে, তিনি ভারতে ইংরেজ-শাসন আরও দৃঢ়মূল করতে পেরেছেন!......তাঁর মতে ভারতবাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংরেজ-কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া, এ ছাড়া তার যেন আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না।"*

* "For a parallel to such an administration, we must, I think, go back to the times of Aurangzebe in the history of our own country. I think even the most devoted admirer of Lord Curzon cannot claim that he has

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহারাণীর ঘোষণাপত্র, শাসনকর্ত্তাদের বড়ই অসুবিধায় ফেলেছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটনের এক গোপন দলিলে তাঁর যে নির্লজ্জ উক্তি বেরিয়েছিল, তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা সবাই জানি যে, ঐ সব দাবী ও আশা-ভরসা কোনদিনই পরিপূর্ণ হবে না, হতে পারেও না। কাজেই হয় ভারতবাসীদের বাধা দিতে হবে, নয়ত তাদের প্রতারিত করতে হবে, এবং আমরা শেষ সোজা পন্থাই (প্রতারণা করা) বেছে নিয়েছি।' আমরা লর্ড লীটনের এই কথাকেই গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি এড়ানোর চরম নজীর বলে মেনে নিচ্ছি।"*

একজন অবাঙালীর পক্ষে বাংলার জাতীয় আন্দোলনে পৌরোহিত্য করতে বসে এমনভাবে গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করা যে কতদূর বিপজ্জনক, বিশেষতঃ সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অগ্নিযুগে,—বর্ত্তমান যুগে তা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু গোখলে মনঃপ্রাণ দিয়ে বাংলাকে ভালবেসেছিলেন বাঙালীকে ভালবেসেছিলেন। কাজেই সেই ভালবাসা আতিশয্যে তিনি ভৌগোলিক পার্থক্য বা জাতিগত বৈ

*"...That the Charter Act of 1833 and the Queen Proclamation of 1858 have created in the eyes of r actionary rulers a most inconvenient situation is clea from a blunt declaration which another Viceroy of Indi the late Lord Lytton, made in a confidential document·